বাংলাদেশ (স্তর ২)

বাধ্যতামূলক শ্রম ও পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে পুরুষ, মহিলা ও শিশু পাচার করা হয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে বাংলাদেশ যেমন মানুষ পাচারের একটি উৎস দেশ, তেমনি এই দেশটি পাচারের জন্য ট্রানজিট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পতিতাবৃত্তি ও দাসত্বমূলক শ্রমসহ অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুরা অভ্যন্তরীণভাবে পাচারের শিকার হয়। ইউনিসেফ ও অন্যান্য সূত্রের আনুমানিক হিসাব মতে, ২০০৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০ হাজার থেকে ২৯ হাজার শিশুকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। তাদের মধ্যে কিছু শিশুকে তাদের বাবা-মায়েরা দাস হিসেবে কাজ করার জন্য বিক্রি করে দেয়, আর অন্যদেরকে প্রতারণা ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে শ্রম অথবা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চাইল্ড স্টাডিজ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পাচারকৃত শিশুদের মধ্যে ছেলে শিশুদের বয়স সাধারণত ১০ বছরের নিচে, আর মেয়ে শিশুদের বয়স ১১ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশুরা পতিতাবৃত্তির জন্য পাকিস্তান ও ভারতেও পাচার হয়ে থাকে। বাংলাদেশি পুরুষ ও নারীরা স্বেচ্ছায় সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, লেবানন ও মালয়েশিয়ায় জীবিকার সন্ধানে যেয়ে থাকে। নারীরা সেখানে মূলতঃ গৃহপরিচারিকার কাজ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ, পারিশ্রমিক না দেওয়া, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ফলে বুঝতে পারে যে তারা বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশি নারী-পুরুষরা মালয়েশিয়া, পারস্য উপসাগরীয় দেশ, জর্ডান ও ফিনল্যান্ডে নির্মাণ অথবা পোষাক শিল্পে চাকুরি করতে যায়। প্রতারণামূলক চাকুরির প্রস্তাব অথবা গন্তব্য দেশে পৌঁছানোর পর তারাও মাঝে মাঝে বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়ে থাকে। বিদেশে চাকুরির জন্য বাংলাদেশি নিয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়ম দেখিয়ে বিভিন্ন অবৈধ ফি আদায় করে থাকে, যা কখনো কখনো ঋণের জালে জড়িয়ে পরার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিদেশে কর্মরত কোন কোন বাংলাদেশি নারী পরবর্তীতে পতিতাবৃত্তির জন্য পাচারের শিকার হয়। পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশি নারী-পুরুষও পতিতাবৃত্তি, গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করার জন্য এবং দাসত্বমূলক শ্রমের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে পাচারের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বার্মা থেকে মহিলাদেরকে ভারতে পাচার করা হয়। মানবপাচার রোধে ন্যূনতম আদর্শমান পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে না পারলেও বাংলাদেশ তা করতে উল্লেখযোগ্যভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যৌন ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য মানব পাচার সংক্রান্ত অপরাধে ফৌজদারী মামলার বিচারকাজের হার গত বছরের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে এবং পাচারকারীরা গুরুতর কারাদণ্ড লাভ করেছে। তবে একই সময়ে দণ্ডপ্রদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

কিছু শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থা বন্ধ করে দেয়াসহ সরকার বিদেশে শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপূর্বক ফৌজদারী আইন প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এসব গ্রেপ্তার-মামলার কোনটিই ২০০৭ সালে নিষ্পত্তি হয়নি। অব্যাহত উদ্বেগসমূহের অন্যতম হচ্ছে বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ দাসত্বমূলক শ্রম ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা। এ ছাড়াও, পাচারের শিকার ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা ব্যাপক।

বাংলাদেশের জন্য সুপারিশঃ প্রতারণামূলক নিয়োগ ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম পাচারের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে আইন প্রয়োগ ও শাস্তি বৃদ্ধি করা; আইন প্রয়োগ প্রচেষ্টার মানোন্নয়ন এবং পাচারে সহযোগিতার জন্য সংশিষ্ট সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করা; এবং পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তির জন্য সুরক্ষা সেবা দেয়া।

আইনগত ব্যবস্থা

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালীন সময়ে পাচার সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তির জন্য বাংলাদেশ সরকার অসামঞ্জস্যমূলক কিছু উদ্যোগ নেয়। সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত)-এর আওতায় পতিতাবৃত্তি অথবা অনিচ্ছাকৃত দাসত্বের জন্য নারী ও শিশু পাচার নিষিদ্ধ করে। এছাড়া দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পতিতাবৃত্তির জন্য ১৮ বছর বয়সের নীচে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু একবছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা অর্থদণ্ডের নির্ধারিত বিধি এসব অপরাধ প্রতিরোধে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। যৌনব্যবসা সংক্রান্ত পাচারের জন্য নির্ধারিত দণ্ডসমূহ ধর্ষণের মত অন্যান্য গুরুতর অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পতিতাবৃত্তির মত অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে পাচারের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম সংক্রান্ত পাচার আইনগতভাবে মোকাবেলায় সরকারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দাসত্বমূলক শ্রম এবং বাধ্যতামূলক শিশু শ্রমের ক্ষেত্রগুলিতে সরকারের দুর্বলতা রয়ে গেছে। বিগত বছরে বাংলাদেশ সরকার পাঁচটি শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এসব সংস্থার বিরুদ্ধে চারটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে। সরকার ৭৬ জনকে গ্রেফতার, ১৯টি তদন্ত পর্যবেক্ষণ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণার জন্য ৩৪টি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলা এখনো তদন্ত অথবা বিচারাধীন রয়েছে। তাই এই প্রতিবেদন তৈরীর বছরে কোন দণ্ড প্রদানের ঘটনা নেই। বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম অথবা দাসত্বমূলক শ্রমের জন্য গ্রেফতার, মামলা, দণ্ড বা শাস্তির কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য বাংলাদেশ সরকার দেয়নি।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে যৌন পাচার অপরাধের জন্য সরকার ১২৩টি তদন্ত শুরু, ১০৬ জনকে গ্রেফতার এবং ১০১টি মামলা দায়ের করে। এছাড়া সরকার ২০টি পাচারজনিত অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করে যা গত বছরের চেয়ে ২৩টি কম। আদালতে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অ-আইনানুগভাবে আদালতের বাইরে বাদী-বিবাদীর মধ্যে অনেক মামলার নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। পাচারকারীদের মধ্যে ১৮ জনকে যাবজ্জীবন এবং বাকী দু'জনকে ১৪ এবং ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়। পাচারকাজে যোগসাজসের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের অভ্যন্তরে ২০টি তদন্ত কাজ পরিচালনা করে। তবে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কোন সরকারী কর্মকর্তাকে পাচারকাজে সহযোগিতার জন্য বিচার, দণ্ড বা শাস্তি দেয়া যায়নি। শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের যৌন নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ মেলেনি।

সুরক্ষা

প্রতিবেদন তৈরির সময়কালে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী শ্রমিকদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশিকা সকল বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনে বিতরণ করেছে। এসব নির্দেশিকায় পাচারকারীদের চিহ্নিত করা ও বিচারের সম্মুখীন করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং বাংলাদেশি পাচারের শিকার ব্যক্তি বৈধভাবে গন্তব্য দেশে প্রবেশ করুক বা না করুক তাকে সহযোগিতা করার কথাও এতে বলা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে পাচারের শিকার বাংলাদেশি ব্যক্তিদের সহায়তা করতে আগে যেসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কেবল নিয়োগকর্তার সাথে আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পাচারের শিকার ব্যক্তিদেরকে সহায়তা করার বিষয়টি সেরকম গুরুত্ব লাভ করেনি। মানুষ পাচার হয়ে থাকে এরকম চিহ্নিত কিছু দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো নিরাপদ আশ্রয় সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাচার-বিরোধী পুলিশ ইউনিট পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তে সাহায্য করতে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের জেল-জরিমানা বা সাজা প্রদান করা হয় না। যদিও বাংলাদেশ পাচারের গন্তব্য দেশ নয়, কিন্তু এদেশের সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উৎস দেশে ফিরিয়ে দিতে আইনগত বিকল্প সহায়তা প্রদান করে না। একটি অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় হল বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা করতে সরকারের প্রচেষ্টার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের বড় অংশ তারাই। এছাড়া পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়।

প্রতিরোধ

বাংলাদেশ মানবপাচার প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করেছে। সরকার গন্তব্য দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে, যেখানে গন্তব্য দেশ, শ্রম আইন, শ্রম চুক্তির শর্তাবলি এবং শ্রম প্রবাহের জন্য ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এধরনের সমঝোতা স্মারক এখনও জনগণের জন্য প্রকাশিত হয়নি এবং পাচার সংক্রান্ত সকল বিষয় এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দেশের অভ্যন্তরে সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সতর্ক করে জনসচেতনতা প্রচারাভিযান চালিয়েছে। এছাড়াও, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দেশত্যাগের আগে পাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকিসম্পন্ন ব্যক্তি ও পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে ও ভ্রমণ বন্ধ করতে যাত্রীদের তল্লাশি করে থাকে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর পুলিশ স্থানচ্যুতির কারণে পাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকিসম্পন্ন নারী ও শিশুদের সক্রিয়ভাবে নজরদারিতে রাখে। বাংলাদেশ সরকার শান্তিরক্ষীদের মোতায়ন করার আগে তাদেরকে পাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। গত এক বছরে বাণিজ্যিক যৌন কর্মকাণ্ডের চাহিদা বন্ধ করতে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা তা বাংলাদেশ জানায়নি।

==========